Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্র ও জাতি-চিন্তা

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ জামান খান
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.6
Pages	69-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্র ও জাতি-চিন্তা

মোঃ জামান খান

বাঙালি জাতিসত্তায় গভীরভাবে প্রত্যয়দৃঢ় এবং হিন্দু–মুসলমানের মিলনতত্ত্বে স্থিতধী ব্যক্তিত্ব এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন মূলত আইনজ্ঞ, কলকাতা হাই কোর্টের বিচারক। কিন্তু কর্মজীবনের অর্থাৎ, পেশাগত পরিচয় তাঁকে অমরত্ব দেয়নি, সাহিত্য–প্রতিভা হিসেবেই তিনি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি, মর্যাদা ও মৃত্যু-ঊর্ধ্ব জীবন লাভ করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় লাভের ঘটনা আকস্মিক না-হলেও অন্যের প্রবর্তনাসৃষ্ট। *সবুজপত্র* (১৯১৪) সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর 'উপদেশ' এবং বন্ধু এস. খোদা বক্স ও সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই তিনি ইংরেজি ছেড়ে বাংলার চর্চা করেন।[১] এস. ওয়াজেদ আলির সৃষ্টিশীল প্রতিভা হিসেবে আত্মপ্রকাশের নেপথ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, তিনিই ওয়াজেদ আলিকে 'ধরে পাকড়ে বাঙলা' লিখিয়েছেন।[২] তারপর প্রাথমিক দ্বিধা যখন কেটে গেছে, একবার যখন তিনি সাহিত্য–সাধনায় রত হয়েছেন তখন সেই সৃষ্টিজগতে আর বিরতি পড়েনি। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন সৃষ্টিচঞ্চল।

এস. ওয়াজেদ আলির স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁর 'ধাত্রী প্রতিভা' প্রমথ চৌধুরী। এস. ওয়াজেদ আলির শিল্পিমানসের সাধর্ম্যের সঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী–চৈতন্যের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁরা উভয়েই রুচিবান ও অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের অধিকারী। প্রমথ চৌধুরী কবিতা বিশেষত, সনেটের চর্চা করলেও তাঁর খ্যাতি ও সিদ্ধি মূলত প্রবন্ধকার ও ছোটগল্পকার হিসেবে। এস. ওয়াজেদ আলির ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় আমাদের জানা নেই। সচেতনভাবেই তিনি প্রবন্ধ ও গল্পের জগৎকে তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী রচনার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় হলেও এই শিল্পভুবন যে এস. ওয়াজেদ

আলির স্বাভাবিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল না তা তাঁর *মোটরযোগে বাঁচির সফর*-এর নিঃসঙ্গতাই প্রমাণ।

প্রমথ চৌধুরীর মতো স্বদেশ, স্বজাতি ও নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলির একটি একান্ত নিজস্ব ধারণা ছিল। বর্তমানকে তিনি অস্বীকার করেননি আবার বৈদেশি কোনো আদর্শ কিংবা কাঠামোর প্রতিও তাঁর কোনো প্রকার মোহজাত আকর্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস আর সেই ঐতিহ্যে শিকড়সঞ্চারী ও বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় বিদেশি ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমেই তিনি তাঁর জাতিসত্তা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্র, জাতি-বিষয়ক ধারণা তাই বায়বীয় কিংবা কোনো কৃতঋণ অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণের প্রেরণাসমভূত নয়। রাষ্ট্র ও জাতিগঠন সম্পর্কে তিনি কোনো নতুন রাষ্ট্রদর্শন প্রবর্তন না-করলেও তাঁর এ বিষয়ক চিন্তা আধুনিক, প্রাগ্রসর এবং এর মাধ্যমে এস· ওয়াজেদ আলির বিশ্বপ্রসারী সচেতনতা ও অধ্যয়নের পরিচয়ই উৎকীর্ণ হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে চতুর্বিদ উপাদান— নির্দিষ্ট ভুখণ্ড, জনসাধারণ, সরকার ও সার্বভৌমত্বের সমবায়ে, জনসাধারণের পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে। এস. ওয়াজেদ আলি সম্ভবত রাষ্ট্রের এই সংগঠন-বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন, একজন সাহিত্যপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। ফলে তাঁর রাষ্ট্রধারণার মধ্যে কোথাও উপরি কিংবা অধিকাঠামো গত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। তিনি তাঁর অন্তর্গত সংবেদনা, মানবপ্রেম ও স্বাদেশিকতাবোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। ওয়াজেদ আলির মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে 'আত্মীয়তা'। অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আত্যন্তিকভাবে রাষ্ট্রগঠনের জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ ও উৎপ্রাণিত না-হলে আধুনিক কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সেই চেতনা ও অবস্থায় উন্নীত হওয়ার জন্যে আবার রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর ঐক্যচেতনা আবশ্যক। একতাবোধের পরিচয়, তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি চারটি ঐক্যের কথা বলেছেন। এগুলি হচ্ছে : (১) কৃষ্টিগত ঐক্য, (২) ভাষামূলক ঐক্য, (৩) স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য এবং (৪) আদর্শমূলক ঐক্য। এ বিবেচনায় তিনি ধর্মীয় ঐক্যেরও উল্লেখ করেছেন। কেননা আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করেন।[৩] কিন্তু তারা অভিন্ন জাতি, একই রাষ্ট্রীয় সত্তার পরিচয়ে বদ্ধ। তাই শুধু ধর্মগত ঐক্য

রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র শর্ত হতে পারে না। এস. ওয়াজেদ আলি এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন এবং এ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত উচ্চারণেও তিনি কুণ্ঠিত হননি : "বর্তমান যুগে ধর্মগত ঐক্যের প্রয়োজন দেখা যায় না।"

তাঁর মতে, পূর্বোক্ত ঐক্যগুলির সঙ্গে 'ভৌগোলিক ঐক্যের বন্ধন জুড়ে দিলেই একটি আধুনিক জাতির সৃষ্টি হয়।[৪]

রাষ্ট্র–সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি রাষ্ট্রের সুরক্ষা–ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লব, রাষ্ট্রের ভাঙন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো সুরক্ষা এর মানচিত্র। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের কথা ভাবলেই দেখা যায় যে, ভৌগোলিক সুরক্ষা–ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর তুলনাই প্রকৃতিই উৎকৃষ্টভাবে রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন :

> ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, আকারে বড়ো হইলেও, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রকৃতি দেবী একটি অখণ্ড দেশ করেই সৃষ্টি করেছেন। আত্মরক্ষামূলক সীমান্তের কথা তুললেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে খাইবার গিরিবর্তের দিকে, হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রাকারশ্রেণীর দিকে, আসামের দুর্গম পার্বত্য ভূমির দিকে, আর দক্ষিণের অন্তহীন সমুদ্রের দিকে।[৫]

ভারতীয় প্রাকৃতিক ভূগোল কিভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে সংহত করেছে সে–বিষয়েও এস. ওয়াজেদ আলি প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন :

> –ভারতবাসীর পক্ষে বৈদেশিক শত্রুকে খাইবার–গিরিবর্ত্মের মুখে ঠেকিয়ে ভারতের অন্য কোনো স্থানে তার গতিরোধের চেয়ে অনেকখানি সহজসাধ্য কাজ।[৬]

কিন্তু জনসাধারণের ঐক্য, সংহতি কিংবা সহমর্মিতার ব্যত্যয় ঘটলে কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থাই রাষ্ট্রকাঠামোকে রক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পরস্পর সন্দেহপরায়ণ, বিশ্বাসহীন ও অনাত্মীয় চেতনাকে লালন করলে বল প্রয়োগ করেও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষায় এস. ওয়াজেদ আলি তাই সর্বপ্রকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধী :

> –সামরিক বিশেষজ্ঞরা যাই বলুন, রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত আত্মরক্ষার উপায় হ'ল রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা।[৭]

এ-প্রসঙ্গে তিনি মধ্যযুগের 'অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্য'-এর কাঠামোর উল্লেখ করেছেন। জাতিগুলির অন্তরে অখণ্ড রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি বলেই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে যে-কৃত্রিম ও চাপিয়ে দেয়া ব্যাবস্থার প্রবর্তন সে-কালে করা হয়েছিল সে-ব্যবস্থার গভীরেই ভাঙনের বীজ নিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ার সঙ্গেই জাতিগত অসন্তোষ, বিদ্রোহী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> যে অন্তরের ঐক্যের উপর একটি রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সে-ঐক্য অখণ্ড ভারতবর্ষে কখনও দেখা দেয়নি। আর তাই কেন্দ্রীয় শক্তি যখনই দুর্বল হয়েছে, স্বাভাবিক একতার উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রগুলি তখনই মাথা তুলেছে।[৮]

কিন্তু অতীতে ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতে যে-ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আনা যাবে না— এ জাতীয় কোনো সংশয়াত্মক চিন্তা এস. ওয়াজেদ আলিকে স্পর্শ করেনি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশাবাদী ও এ কালের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে সচেতন। তাঁর মতে, সবার জন্যে একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে জনসাধারণের মধ্যেও একটি মৌলিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের জন্ম হওয়া প্রয়োজন। 'একের মধ্যে বহুত্ব, আর বহুর মধ্যে একত্ব—এই উভয়বিধ মঙ্গল'[৯] চিন্তায় জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনায়কেরা উদ্দীপিত হলে নিজের বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীতে পরিণত হওয়া সম্ভব। এস. ওয়াজেদ আলির এ ধারণার সঙ্গে স্পষ্টতই আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদী চেতনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'রাষ্ট্রের রূপ' প্রবন্ধেও তিনি জাতীয়তাবাদকেই আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের অনিবার্য দর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন :

> এক কথায় বলতে গেলে জাতীয়তাবাদের Nationalism আদর্শ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুবিধাজনক এক ভৌগোলিক পরিবেশ বা এলাকার মধ্যে মূর্ত করে তোলা; তার সেবায় তার শক্তি ও মঙ্গলের সাধনায় মানুষের সর্ববিধ শক্তি এবং প্রয়াসকে পরিচালিত করা; এবং সেই ভৌগোলিক পরিবেশকে সর্বপ্রকার সামবায়িক জীবনের স্নায়বিক কেন্দ্রে পরিণত করা। এই ভাবেই বর্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে উঠেছে; আর তারাই এখন মানব জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইউনাইটেড স্টেট্স্, জাপান প্রভৃতির কথা কে না জানে?[১০]

তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণাও অত্যন্ত সুবিস্তৃত। জাতীয়তাবাদকে তিনি একটি উগ্র, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠামূলক সামরিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাব হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর জাতীয়তাবোধ জাতিকে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক কিংবা বৈদেশিক কোনো বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে শেখায় না। এ আদর্শ জাতিকে সচেতন করে

তাকে সমুৎকর্ষিত হতে সাহায্য করে। এস. ওয়াজেদ আলির জাতয়ীতাবাদী চেতনা তাই নয়টি লক্ষ্যে নিবেদিত।

[এক] এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবোধের একটি নির্দিষ্ট 'ভৌগোলিক রূপ' আছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয়তাবোধের এই ভৌগোলিক পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> দেশপ্রেম বললে দেশের প্রতি প্রেম, কোনখানে তার সীমানা, কোনটা বিদেশ, দেশের মানুষ কারা, দেশের মানুষ কারা নয়, কারা প্রতিবেশী, কারা প্রতিবেশী নয়, এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে মূর্ত হয়ে ওঠে, আর তার ভাব ও অনুভূতিকে বিশেষ একটা রূপ দিতে, তার প্রয়াসকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।[১১]

[দুই] জাতীয়তাবাদ 'সাধনার এবং বৈধতার ও অবৈধতার সহজবোধ্য এবং প্রমাণসাপেক্ষ একটা মাপকাঠির (stanard) আদর্শ' নাগরিকদের সামনে তুলে ধরে। ফলে তাদের মধ্যে একটি বিচারবোধের সৃষ্টি হয়। তখন তারা দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, 'কারা দেশের উপকার করেছে, কারা দেশের অনিষ্টকরছে— সে-সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও বাস্তবনিষ্ঠ ধারণা লাভ করে।

[তিন] জাতীয়তাবোধ আধুনিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার চর্চায় নাগরিকদের উৎসাহী করে। ফলে তাঁদের সৃষ্টিশীলতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা প্রকৃত অর্থেই অনুধাবন করতে পারে যে, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয় না। আর সেই বিকাশ ও অগ্রগতি অর্জিত হলে অধিবাসীদের পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়.তখন 'মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে, কি করে না, দেবতাদের বিষয়ে কি কি ধারণা মনে পোষণ করে, পরকাল বিশ্বাস করে কি না'— সে-চিন্তাকে প্রাধান্য দেয় না।

[চার] এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবোধ 'জনসমিতিকে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ঐক্যের এবং সম্প্রীতির পথে নিয়ে যায়'। তাই 'যে সব বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা অল্প এবং যে সব বিষয়ে মতদ্বৈধতার সম্ভাবনা আছে'— এমন সব বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করে।

[পাঁচ] 'এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষের সর্ববিধ সামবায়িক সাধনার প্রশস্ততম ক্ষেত্রের সন্ধান দেয় বলে এ পথে 'মানুষ সহজেই দেশপ্রেমিকের সহযোগিতা লাভ করতে পারে এবং সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পারে'।[১২]

[ছয়] 'জাতীয়তাবাদের আদর্শ মানুষের দৃষ্টিকে' ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে। 'অতীতের আনুগত্য' তখন তার দৃষ্টিকে 'অন্ধ' এবং তার সাধনাকে 'পঙ্গু'

করে না। জাতির মঙ্গলচিন্তা ও ভবিষ্যৎ-ভাবনা তখন বিজ্ঞানবোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়।

[সাত] জাতীয়তাবোধ মানুষকে তার নিজের কর্মের 'সামাজিক মূল্য' অনুধাবনে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> তার কাজ থেকে সমাজের উপকার হবে কি না, কতটা উপকার হবে, তার কাজে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না তার কাজে ইষ্টের সম্ভাবনা বেশী, কি অনিষ্টের সম্ভাবনা বেশী, এসব বিষয় জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিচার করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং মতের ঐক্যস্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ।[১৩]

[আট] জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে আলোচনা ও আন্দোলনের মাধ্যমে সর্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায় তাদের অধিকার অর্জনের সুযোগ পায়। তখন 'প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহের ভাব সহজে' অধিবাসীদের মধ্যে জাগ্রত হয় না।

[নয়] জাতীয়তাবোধ 'আদর্শ সেবার ও সাধনার নিত্য নূতন পথে যেতে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে'। তখন 'অবান্তর কথা ভাবার তার সময় থাকে না' এবং সে বোঝে যে, অতীতের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন পন্থা প্রাচীন পন্থার চেয়ে ভাল। প্রাচীন পন্থীদের মতামত, সমর্থন বা অসমর্থন তার সহজ বুদ্ধিকে বিকৃত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না।'[১৪]

এস. ওয়াজেদ আলির সমকালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার নির্বাচিত কিছু প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ধর্মকে তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত বলে মানেন নি। তাঁর মতে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে গভীর ধর্মবিশ্বাসকে নিজের অন্তর্মূলে বহন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তিও স্মরণীয় :

> ধর্মে আমি একান্তভাবে আস্থা রাখি, আর ধর্মকে আমি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার উপরই ধর্মের পূর্তি ও পুষ্টি বলা যায়।[১৫]

মানুষের ধর্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের মধ্যে এস. ওয়াজেদ আলি তাই মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য লক্ষ করেছেন। রাষ্ট্রকে তিনি ইহজাতিক স্বার্থ-চরিত্রের উপায়রূপে বিবেচনা করেছেন :

> রাষ্ট্রের কারবার হ'ল ইহজীবনের স্বার্থ ও সুবিধে নিয়ে; ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা,

> বংশগতস্বার্থ-সুবিধা, শ্রেণীগত স্বার্থ-সুবিধা, জাতিগত স্বার্থ-সুবিধা— এই সব স্বার্থ-সুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার।[১৬]

সে-ক্ষেত্রে 'ত্যাগ, সংযম আর পবিত্রতা'-কেই তিনি 'প্রকৃত ধর্মের' ভিত্তি বলে বিশ্বাস কচ্ছেন। ধর্মকে রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে তিনি তাই চাননি। তাঁর মতানুসারে সে-ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা জনসাধারণ ও রাষ্ট্র— কারোর জন্যে সুখকর হয় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তও অত্যন্ত স্পষ্ট :

> ধর্ম যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছে, সেখানেই শাশ্বত সত্যের বিরুদ্ধে, প্রকৃত ধর্মাত্মাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের অভিযোগ চালিত হয়েছে, আর তার ফলে উন্নতির পথ ছেড়ে সমাজের অধোগতি হয়েছে; ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে দুর্বার রাষ্ট্রশক্তি যোগ দিয়েছে, আর উভয়ে মিলে সত্যকে পদদলিত করেছে।[১৭]

তাঁর মতে, রাষ্ট্র-পরিচালনায় অনেক সময় 'ধর্মের ধুরন্ধর' ব্যক্তিরা 'প্রকৃত ধার্মিক ও সত্যসাধকদের বিরুদ্ধে তুমুল' সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সংগ্রামে কপট ধর্মচারীরাই জয়যুক্ত হয়েছেন আর যিশুখ্রিষ্টের মতো 'প্রকৃত ধার্মিকগণ ক্রস-কাষ্ঠে' দেহত্যাগ করেছেন।

বস্তুত, এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্রচিন্তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রাষ্ট্রধারণার সমান্তরাল নয়। তিনি রাষ্ট্র বলতে পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রে গড়ে ওঠা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ একটি জনসমষ্টি ও প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত একটি ভূখণ্ডকে বুঝিয়েছেন। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে তিনি গণতন্ত্রবাদী। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন ও স্থায়িত্ব তাঁর মতে অধিবাসীদের উপরই নির্ভর করে। তারা ঐক্য চেতনাকে লালন করলে ও ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হলেই রাষ্ট্রের কোন প্রকার অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের এস. ওয়াজেদ আলি বিরোধী। তাঁর মতে, সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এই জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য চেতনা গড়ে ওঠে না। সামরিক শক্তির প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গেই তাই দেখা দেবে অন্তর্বিপ্লব, জাতিগুলি তখন হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন। ধর্মকে এস. ওয়াজেদ আলি রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার শর্ত বলে গ্রহণ করেননি। ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত, আত্মিক উন্নতির উপায় বলেই তিনি মনে করেছেন। কেননা রাষ্ট্রকে তিনি মানুষের ইহলৌকিক উন্নতির উপায় বলে মানেন নি। রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মকে স্থান দিলে ধর্মের মাহাত্ম্য খণ্ডিত হয়ে পড়ে বলেই তাঁর বিশ্বাস। অর্থাৎ, একটি ধর্মনিরপেক্ষ, উদার নৈতিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই এস. ওয়াজেদ আলি সবার জন্যে কামনা করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ এস. ওয়াজেদ আলি : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, *এস. ওয়াজেদ আলি-রচনাবলী* , প্রথম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ৫৭৩

২—; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, *এস. ওয়াজেদ আলি* , ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ১৭

৩ *এস. ওয়াজেদ আলি-রচনাবলী* (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন), প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৯

৪ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৯

৫ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৭

৬ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৭

৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৮

৮ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৯-৮০

৯ পূর্বোক্ত, পৃ ২৮০

১০ পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৯

১১ পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৯

১২ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯১

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯১

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯২

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯২

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৭